লোকউৎসবের আলোকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'

প্রীতম মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম শোনা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে ভেসে ওঠে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি। মালোদের জীবনকথার এমন বিশ্বস্ত চিত্র সহজে মিলবে না। মালোদের পূজাপার্বণের ও আনন্দানুষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা নেহাত কম কিছু নয় আর সেই ধারায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কথাসাহিত্যে সার্থক কৌম জীবনের রূপকার। তিনি নিজে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া অঞ্চলের তিতাস নদীর তীরবর্তী মালোসমাজ থেকে উঠে এসেছিলেন। তিতাস নদীর সঙ্গে তার জীবনের সংযোগ অত্যন্ত গভীর। তাই তিতাস নদীর তীরবর্তী মালোজীবনের স্বরূপ, বিবর্তন, সংস্কৃতি তাঁর রক্তস্পন্দনে মিশে আছে। তাঁর লেখা এই উপন্যাসে তিতাস তীরবর্তী মালোজীবনের সামগ্রিক জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসের সূচনাতেই আছে তিতাস নদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—"তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূল জোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণ ভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।"[১] "ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।"[২]

এই উপন্যাসে একদল মালো সমাজের জেলে সম্প্রদায় কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে সেটি তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসটি চার খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ডে আবার দুটি করে অনুচ্ছেদ আছে, প্রতি অনুচ্ছেদে কাহিনিকে সুবিন্যস্ত করেছে নানা চরিত্র, তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, মানুষের জন্যে মানুষের ভালবাসাবাসি, পূজাপার্বণ, হোলি মেলায় এত আনন্দ, এতো উৎসব যা নানা কষ্টের মধ্যেও কিছু সময়ের জন্য ঢেকে রেখেছে, মাতিয়ে রেখেছে তাদের। এখানেই হয়তো সেই মালো সমাজের মানুষেরা তিতাস নদীকে নিজের ভেবে বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। অতএব এই উপন্যাসে যে সকল উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি এখন পর্যালোচনা করব।

প্রথমেই যে উৎসবের কথা উঠে এসেছে সেটি হল 'মাঘমণ্ডলের ব্রত'। মাঘ মাসে মালোপাড়ায় কুমারীরা এই ব্রত উৎসব পালন করে। কুমারী মেয়েরা বিয়ের উদ্দেশ্যে এই মাঘমণ্ডলের পূজা করে। এই ব্রতে কুমারীরা আনকোরা শাড়ি অঙ্গে তুলে আর মাথাটা তেল জবজবে করে নদীতে আসে। তাদের মাথার ওপর দুলতে থাকে চিত্র-বিচিত্র চৌয়ারি। কুমারীরা একে একে চৌয়ারিগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। তখন মালোপাড়ার ছেলের দল ভাসমান

চৌয়ারিগুলো ধরবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চৌয়ারি কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে রাখার জন্য শুরু হয় প্রতিযোগিতা। কুমারীরাও চায় তাদের চৌয়ারিগুলো পাওয়ার জন্য ছেলেরা কাড়াকাড়ি করুক। কারণ তারা মনে করে ছেলেরাই যদি না ধরতে পারলো তবে মেয়েদের চৌয়ারি ভাসিয়ে লাভ কি? মাঘমণ্ডলের তিরিশ দিনই কুমারীরা তিতাসের ঘাটে প্রাতঃস্নান করে আর প্রতিদিন স্নানের শেষে বাড়ি এসে ভাঁটফুল আর দুর্বা বাঁধা ঝুটার জল দিয়ে কর পূজা করে—"লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।"[৩]

এই নদীর তীরবর্তী হিন্দু মালোসমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের সরস রূপায়ণ দেখা যায় এই উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক এখানে বৈষ্ণব, বাউল, ভাটিয়ালি গানের পাশাপাশি লোকজীবনের নানা বিচিত্র উৎসব-নৌকাবাইচ, পদ্মপুরাণ পাঠ ও জন্ম-মৃত্যু বিবাহ নিয়ে নানা উল্লাস বেদনার বর্ণনা দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক মালো সম্প্রদায়ের একটি সুখপাঠ্য উৎসব বিবরণী তুলে ধরেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবিরবন্ধন, পাঁচপীরের বদরধ্বনি, গুরুকরণ, কালীপূজার বারোয়ারী আয়োজন, উত্তরায়ণসংক্রান্তি, মনসাপূজা, তুলসীতলায় প্রণাম।

চৈত্রের মাঝামাঝি তখন বসন্তের পূর্ণ যৌবন, আসল দোলপূর্ণিমা। বসন্ত এমন ঋতু যা সকলের মনে প্রেম সঞ্চার করে, জাগায় রঙের নেশা। এখানে দেখা যায় মালো সম্প্রদায়ের জেলেরা শুধু নিজেরাই রঙ মেখে তৃপ্তি পায় না, তারা নিজেদের প্রিয় বলে যাকে মনে করে তাদেরকেও রঙ মাখিয়ে সাজাতে চায় এবং সেই প্রিয়রাও জেলেদের রঙ মাখিয়ে সাজাক এটাও তারা চায়। যেন আকাশে বাতাসে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায় রঙ আর সেই রঙ তাদের সকলের মনে মনে। "তারা ঘটা করিয়া দোল করিবে, দশজনকে নিয়া আনন্দ করিবে।"[৪]

তারা তাদের নৌকাগুলোকেও সাজায়। একটি ছোটো থালায় আবির ও ধানদুর্বা সাজিয়ে বউ-ঝিরা নদীতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে সেই সাজানো থালা এগিয়ে দেয় নৌকাতে থাকা পুরুষের দিকে আর সেই পুরুষ থালার আবির গুলে নিষ্ঠার সঙ্গে নৌকাকে মাখিয়ে দেয়। তারপর ধান দুর্বাগুলি আঙ্গুলে তুলে ভক্তিভরে সেই আবির মাখানো জায়গার ওপর রাখে। সেই আবিরের রঙে তিতাস নদীর বুকেও রঙের খেলা জাগে।

শ্রাবণ মাসে প্রতিরাতে অনুষ্ঠিত হয় পদ্মাপুরাণ পাঠ দিশা, লাচারি ইত্যাদি সুরে তারা তা পাঠ করে। আবার শ্রাবণ মাসের শেষেই প্রতি ঘরে মনসা পুজোর আয়োজন করা হয়। শুরু হয় জালা বিয়ে। মালো তরুণীরা বেহুলার এয়োতীর স্মরণ চিহ্নরূপে মেয়েতে মেয়েতে এই বিয়ের অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতি ঘরেই তারা মনসা পুজো করে কারণ অন্যান্য পূজার চাইতে মনসা পুজোয় আনন্দ অনেক বেশি এবং খরচ সামান্য।

শ্রাবণের শেষ দিন অবধি পদ্মাপুরাণ পাঠ করা হয়, কিন্তু পুঁথি সমাপ্ত করা হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসাপুজোর পরদিন সকালে সেটি পাঠ করা হয়। সেদিন জেলেরা আর জাল বাইতে যায় না। তারা খুব করে এই পদ্মাপুরাণ গায়, আর খোল করতাল বাজায়। এছাড়াও ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে গুরুবচন, মুর্শিদা বাউল, ব্রহ্মপুত্র, কীর্তনের শোক, বারোমাসি ইত্যাদির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মালো সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবনযাত্রাকে রেখায়িত করেছেন।

জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুকে ঘিরেও মালো পাড়ায় উৎসব দেখা যায়। যখন শিশু জন্মায় তখন

অনেক নারীর ডাক পড়ে গান গাওয়ার জন্য। অন্নপ্রাশনের দিন প্রথমে স্নানযাত্রা, শিশু কোলে মাকে মাঝখানে করে গান গাইতে গাইতে সকল নারী তিতাসের ঘাটে যায় সেখানে মা ও শিশু তিনবার তিতাসকে প্রণাম করে অঞ্জলি জল নিয়ে শিশুর মাথা ধুইয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে তা মুছিয়ে নদীকে আবার নমস্কার করে বাড়ি ফিরে আসে। তারপরই তারা সকলে যায় রাধামাধবের মন্দিরে, সঙ্গে একথালা পরমান্ন। সেই পরমান্ন নিবেদন করে প্রসাদ করা হয় এবং তা প্রথমে মা তার সদ্যজাত শিশুর মুখে তুলে দেয় এবং বাকি প্রসাদ উপস্থিত সকলকে বিতরণ করা হয়। "প্রতি ঘরেই জন্ম হয়, বিবাহ হয়, মৃত্যু হয়।"[৫]

মালোরা সবচেয়ে বেশি আনন্দ উল্লাস পায় বিবাহ উৎসবে। বিবাহ যে করে তার তো সুখের অন্ত নেই এমনকি পাড়ার আর সব লোকেরাও সেই দিনটিকে অতি উত্তম বলে মনে করে। যারা সবচেয়ে প্রিয়, যারা অতি নিকটের তাদেরকে বিবাহ করে বউ নিয়ে আনন্দ করতে দেখলে মালোরা খুব খুশি হয়। আর যে বিবাহ করতে পারতো না তার রাত্রিযাপন হতো নৌকাতে। "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই তিন নিয়াই সংসার।"[৬]

মালোপাড়ার কালীপূজোতে হয় সব থেকে বেশি সমারোহ। বিদেশ থেকে কারিগর এনে পূজার একমাস আগে মূর্তি বানানো হয়। "মূর্তির গলার উপর যেদিন মাথা পরান হইল সেদিন মনে হইল এত বড়ো মূর্তি যেন কথা কহিতে চায়।"[৭]

প্রথমে প্রকাণ্ড বাঁশের কাঠামো, তাতে খড় পাট সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা ও তিতাসের ঘাটের মাটি নরম করে তাতে লেপন করা ও মূর্তির মাথা গঠন করা হয়। তারপর তার ওপর পালিশ করে চক্ষুদান ও নানা রঙ করে কারিগরের কাজ শেষ হয়। সেই রাতেই হয় পুজো। সকলে পুজোর আগের দিন নিরামিষ খায়, পূজার দিন প্রাতঃস্নান করে, পুজোর জল তোলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় এবং নামাবলী ও ফুলের মালা ধারণ করে যে পুরোহিত পুজোয় বসে তার নির্দেশ মতো নানা দ্রব্য এগিয়ে দেয়। অর্ধেক পূজা তারাই সমাপ্ত করে।

এরপর আসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির কথা। কালীপূজার সময় গানবাজনার আমোদ আহ্লাদে মালোরা অনেক টাকা খরচ করে কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার জন্য তারা বেশি খরচ করে এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসবে। পৌষ মাসের শেষে পাঁচ-ছয়দিন ধরে চালের গুড়ি তৈরি করা হয়। মুড়ি ভেজে ছাতু কোটার তোড়জোড় লাগে। চালের গুড়ি রোদে শুকিয়ে খোলাতে ঢেলে পিঠার জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং অনুষ্ঠানের আগের দিন সারারাত জেগে মেয়েরা পিঠে বানায়। সেই পিঠার রকম বিচিত্র এবং সংখ্যায় অসংখ্য। পরের দিন সকালেই লাগে পিঠে খাওয়ার ধুম। নারী-পুরুষ ছেলে, বুড়া সকলেই ভোরবেলা উঠে তিতাসের ঘাটে স্নানে যায়। তারা যত সকালে স্নান সেরে পিঠে খাওয়া শেষ করবে তত সকালে গ্রামের নগরকীর্তনও শুরু হয়ে যায়। সারা গ্রাম জুড়ে এই কীর্তন করার জন্য প্রথমেই বেড়িয়ে পড়ে মালোপাড়ার দল এবং তারপরই সাহাপাড়া, যোগীপাড়ার দল তাদের দেখাদেখি বেড়িয়ে পড়ে। মালোরা কীর্তন করে নেচে-কুঁদে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে। পুরুষেরা কীর্তন করে বেড়ায় আর মেয়েরা ঘরেতে নানা পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন রান্না করে। তিতাস নদী এবং তার তীরবর্তী মালোদের জীবন নিয়ে অতি সহজ স্বাভাবিক আখ্যান রচনা করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। উপন্যাসের পটভূমি তিতাস নদী কিন্তু তার সঙ্গে যোগ রয়েছে মালোদের জীবন-সংস্কৃতি, উৎসব, আচার-আচরণ, জীবিকা

ধারণের নানান কাহিনি। তিতাস অতি সাধারণ একটি নদী কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবিবরণীতে গর্বে ফুলে ওঠার মতো তার হয়তো কোনো ইতিহাস নেই। কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, আনন্দ-উৎসবের বিশেষ মুহূর্তগুলি তার তীরে তীরে আঁকা আছে। মালোদের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে আখ্যানকার উল্লেখ করেছেন—

> মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় যে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।[৮]

এছাড়াও বিভিন্ন উৎসবে তাদের লোকগানগুলিও চরিত্রের মনের এবং বাস্তব জীবন সংসারের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে। তারা সকলে গলা মিলিয়ে সুর তুলে গায়—

> না ওরে বন্ধ বন্ধ কি আর বন্ধ রে,
> তুই শ্যামে রাধারে করিলি কলঙ্কিনী।
> মথুরার হাটে ফুরাইল বিকিকিনি।।[৯]

মালোরা এসব গান তাদের বাপ পিতামহের কাছ থেকে শেখে। তাদের গানে বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ সুরের সঙ্গে মিশে থাকে মানবাত্মার গভীর আকুতি। আজ সেই গান সেই সুরে হৃদয়ের নিভৃত ভাব যেন আর আগের মতো দানা বাঁধে না। তাদের সকল উৎসব আজ হারিয়ে গেছে সমাজ পরিবর্তনের সূত্র ধরে। তাই বর্তমান সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে অতি সংকট বুঝে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার দিক ঠিক করতে না পারলে, বেঁচে থাকা বড়ো কঠিন হয়ে ওঠে অন্তত পুরোনো সংস্কারধারী লোকজীবনের কাণ্ডারীদের। এইভাবেই মালো জীবনের স্বভাব-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং তিতাসের প্রকৃতির আঙিনায় তাদের লোকজীবিকা বিশেষত লোকউৎসবের এক জীবন্ত বাস্তব সত্য ও চিত্র তুলে ধরেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে।

উৎসের সন্ধানে

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ : 'তিতাস একটি নদীর নাম', পুঁথিঘর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৮, পৃ. ১৩
২. তদেব : পৃ. ১৭
৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণ : 'তিতাস একটি নদীর নাম', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃ. ৩১
৪. তদেব : পৃ. ৫২
৫. তদেব : পৃ. ১০২
৬. তদেব : পৃ. ১০২
৭. তদেব : পৃ. ১০৯
৮. অদ্বৈত মল্লবর্মণ : 'তিতাস একটি নদীর নাম', পুঁথিঘর, কলকাতা, দ্বাবিংশ প্রকাশ, মাঘ ১৪১৫, পৃ. ৩১৫
৯. তদেব : পৃ. ৩২২